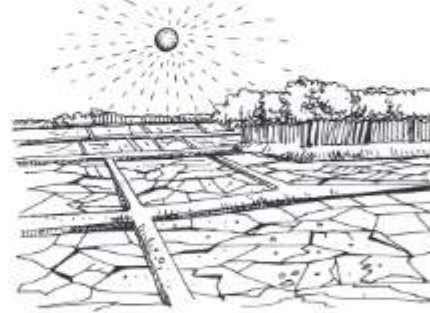


চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে কৃষি মৌসুম, কৃষি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য, রবি, খরিপ ও মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল এবং এসব ফসলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরে ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু যেমন— অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রতিকূল পরিবেশে ফসলের কী কী ধরনের ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- কৃষি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব ;
- রবি ও খরিপ মৌসুমের ফসলাদি শনাক্ত করতে পারব ;
- মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলাদি শনাক্ত করতে পারব ;
- কৃষি উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- কৃষি উৎপাদন ও কৃষি পরিবেশ বিবেচনায় বাংলাদেশকে প্রধান কয়েকটি অঞ্চলে চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ -১ : কৃষি মৌসুম

ষষ্ঠ শ্রেণির চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। কোন অঞ্চলে কখন কোন ফসল জন্মাবে তা নির্ভর করে সে অঞ্চলের জলবায়ুর উপর। তাই কোনো অঞ্চল বা দেশের ফসল উৎপাদনের ধরন ও সময় জানতে হলে সে অঞ্চল বা দেশের জলবায়ুকে জানতে হবে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যালোক, বায়ুচাপ, বায়ুর আর্দ্রতা ইত্যাদি হলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। এ উপাদানগুলোই ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ও দূরত্ব, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন। পরিমিত বৃষ্টিপাত, মধ্যম শীতকাল, আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের জলবায়ু কৃষি উৎপাদনের জন্য খুবই সহায়ক।

একটি ফসল বীজ বপন থেকে শুরু করে তার শারীরিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল উৎপাদনের জন্য যে সময় নেয় তাকে ঐ ফসলের মৌসুম বলে। অর্থাৎ কোনো ফসলের বীজ বপন থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সময়কে সে ফসলের মৌসুম বলে। বাংলাদেশের জলবায়ুর উপর নির্ভর করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল জন্মে। ফসল উৎপাদনের জন্য সারা বছরকে প্রধানত দুটি মৌসুমে ভাগ করা হয়েছে; যথা—

ক. রবি মৌসুম

খ. খরিপ মৌসুম

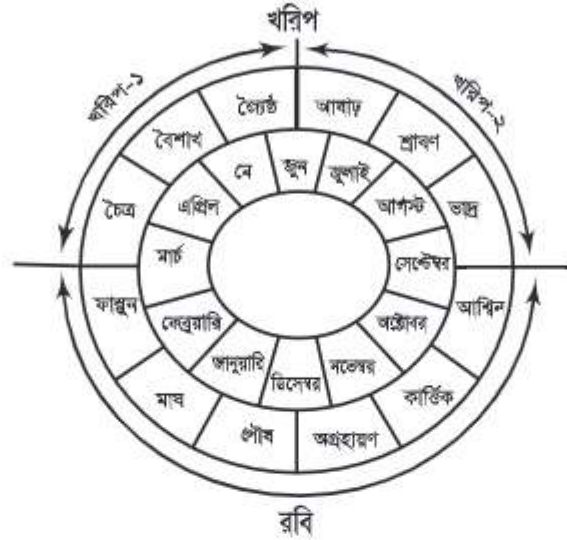
ক. রবি মৌসুম : আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কে রবি মৌসুম বলে। রবি মৌসুমের প্রথম দিকে কিছু বৃষ্টিপাত হয়, তবে তা খুবই কম হয়ে থাকে। এ মৌসুমে তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত সবই কম হয়ে থাকে।

খ. খরিপ মৌসুম : চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ মৌসুম বলে। খরিপ মৌসুমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা— খরিপ-১ বা গ্রীষ্মকাল এবং খরিপ-২ বা বর্ষাকাল।

খরিপ-১ : চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ-১ মৌসুম বা গ্রীষ্মকাল বলা হয়। এ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং মাঝে মাঝে ঝড়, বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে।

খরিপ-২ : আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ-২ মৌসুম বা বর্ষাকাল বলা হয়। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং তাপমাত্রা মাঝারি মাত্রার হয়।

যে সকল ফসলের বৃদ্ধি ও ফুল-ফল উৎপাদন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর আর্দ্রতা, দিনের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় কেবল সে সকল ফসলেরই মৌসুমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করা হয়। বহু বর্ষজীবী ফসল যেমন-ফলদ, বনজ ও ঔষধি ফসলের ক্ষেত্রে মৌসুমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ তেমন প্রযোজ্য নয়।



চিত্র-৪.১ : কৃষি মৌসুম

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে কৃষি মৌসুমের বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : কৃষি মৌসুম, রবি মৌসুম, খরিপ-১, খরিপ-২

পাঠ-২: রবি মৌসুমের ফসল

রবি ফসল: যেসব ফসলের শারীরিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল উৎপাদনের পুরো বা অধিক সময় রবি মৌসুমে হয় তাদেরকে রবি ফসল বলে। রবি ফসলকে শীতকালীন ফসলও বলা হয়ে থাকে। রবি ফসলের বৈশিষ্ট্য জানতে হলে আমাদের রবি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জানতে হবে। রবি মৌসুমের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

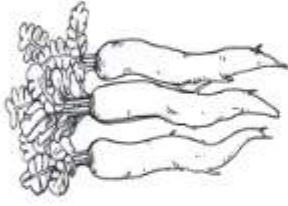
১. তাপমাত্রা কম থাকে।
২. বৃষ্টিপাত কম হয়।
৩. বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকে।



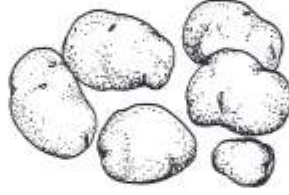
চিত্র-৪.২ : খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ

৪. ঝড়ের আশঙ্কা কম থাকে।
৫. শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা কম থাকে।
৬. বন্যার আশঙ্কা কম থাকে।
৭. রোগ ও পোকাকার আক্রমণ কম হয়।
৮. পানিসেচের প্রয়োজন হয়।
৯. দিনের চেয়ে রাত বড় বা সমান হয়।

রবি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এ মৌসুমে কোন ধরনের ফসল জন্মায়। যেসব ফসল চাষাবাদের জন্য কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় সেসব ফসল রবি মৌসুমে চাষাবাদ করা হয়। রবি মৌসুমে আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, লাউ, শিম, ওলকপি, ব্রোকলি, শালগম, পালংশাক, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উদ্যান ফসল চাষ করা হয়। মাঠ ফসলের মধ্যে রয়েছে বোরো ধান, গম, সরিষা, তিসি, মসুর, ছোলা, খেসারি ইত্যাদি। এ মৌসুমে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়।



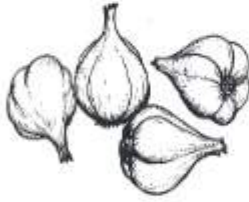
মুলা



গোল আলু



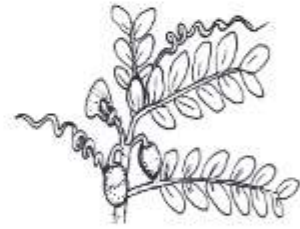
বাঁধাকপি



রসুন



গমের শিষ



ছোলা গাছ

চিত্র-৪.৩: বিভিন্ন প্রকার রবি ফসল

নতুন শব্দ : রবি ফসল, রবি ফসলের বৈশিষ্ট্য, রবি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য

পাঠ- ৩ : খরিপ মৌসুমের ফসল

যেসব ফসলের শারীরিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল উৎপাদনের পুরো বা অধিক সময় খরিপ মৌসুমে হয় তাদেরকে খরিপ ফসল বলে। খরিপ ফসলের বৈশিষ্ট্য জানতে হলে আমাদের খরিপ মৌসুমের বৈশিষ্ট্য জানতে হবে। খরিপ মৌসুমের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. এ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে।

২. বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

৩. বায়ুর আর্দ্রতা বেশি থাকে।

৪. ঝড়ের আশঙ্কা বেশি থাকে।

৫. শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকে।

৬. বন্যার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৭. রোগ ও পোকাকার আক্রমণ বেশি হয়।

৮. পানি সেচের তেমন প্রয়োজন হয় না।

৯. দিনের দৈর্ঘ্য রাতের দৈর্ঘ্যের সমান বা বেশি হয়।



চিত্র-৪.৪ : মেঘলা আকাশ



চিত্র-৪.৫ : ঘূর্ণিঝড়

যেসব ফসল চাষাবাদের জন্য বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়

সেসব ফসল খরিপ মৌসুমে চাষাবাদ করা হয়।

খরিপ মৌসুমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—

খরিপ-১ : এ মৌসুমে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় এবং মৌসুমের শেষের দিকে বেশি বৃষ্টিপাত শুরু হয়। কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা বেশি। এ মৌসুমে দেশের অনেক অঞ্চলে ঢল বন্যার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সময় তাপমাত্রা খুব বেশি এবং বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ মাঝারি থাকে। ফসলে রোগ ও পোকাকার আক্রমণ মাঝারি হয়। ফসল উৎপাদনে মাঝারি ধরনের সেচের প্রয়োজন হয়। এ মৌসুমের প্রধান ফসল হলো— পাট, তিল, ডাঁটা, মুখি কচু, টেঁড়স, চিচিঙ্গা, বিজা, করলা, পটোল, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, তরমুজ, বাজী এ সময়ে পাকে।



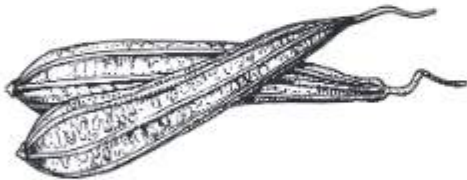
মিষ্টি কুমড়া



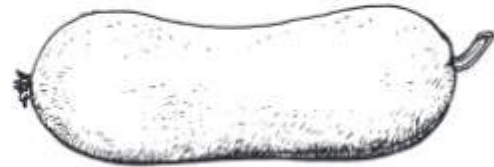
তরমুজ

চিত্র-৪.৬: খরিপ-১ মৌসুমের ফসল

খরিপ-২ : এ মৌসুমে সাধারণত বৃষ্টিপাত খুব বেশি হয়। ঝড় ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা কম থাকে তবে বন্যার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাপমাত্রা ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। ফসলে পোকাকার আক্রমণ ও রোগ বেশি হয়। ফসল উৎপাদনে কৃত্রিম পানি সেচের প্রয়োজন তেমন হয় না। এ মৌসুমের প্রধান ফসল হলো— আমন ধান, পানি কচু, চাল কুমড়া, টেঁড়স, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল ইত্যাদি। এ সময়ে তাল, আমলকী, আনারস, আমড়া, পেয়ারা, নাবি জাতের আম ও কাঁঠাল এবং বাতাবি লেবু পাকে।



ঝিঙ্গা



চাল কুমড়া

চিত্র-৪.৭: খরিপ-২ মৌসুমের ফসল

| কাজ : ঋতু অনুযায়ী শস্যের/ফলের বিন্যাস কর। | | | |
|---|-----|--------|--------|
| ফসলের/ফলের নাম | রবি | খরিপ-১ | খরিপ-২ |
| পাট, আমন ধান, আলু, তিল, টেঁড়স, ফুলকপি, কাঁঠাল, আনারস, পেঁয়াজ, তরমুজ, চালকুমড়া, সরিষা, মুখিকচু, তাল, মসুর | | | |

নতুন শব্দ : খরিপ ফসল, খরিপ-১ এবং খরিপ-২ মৌসুমের বৈশিষ্ট্য

পাঠ-৪ : মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল

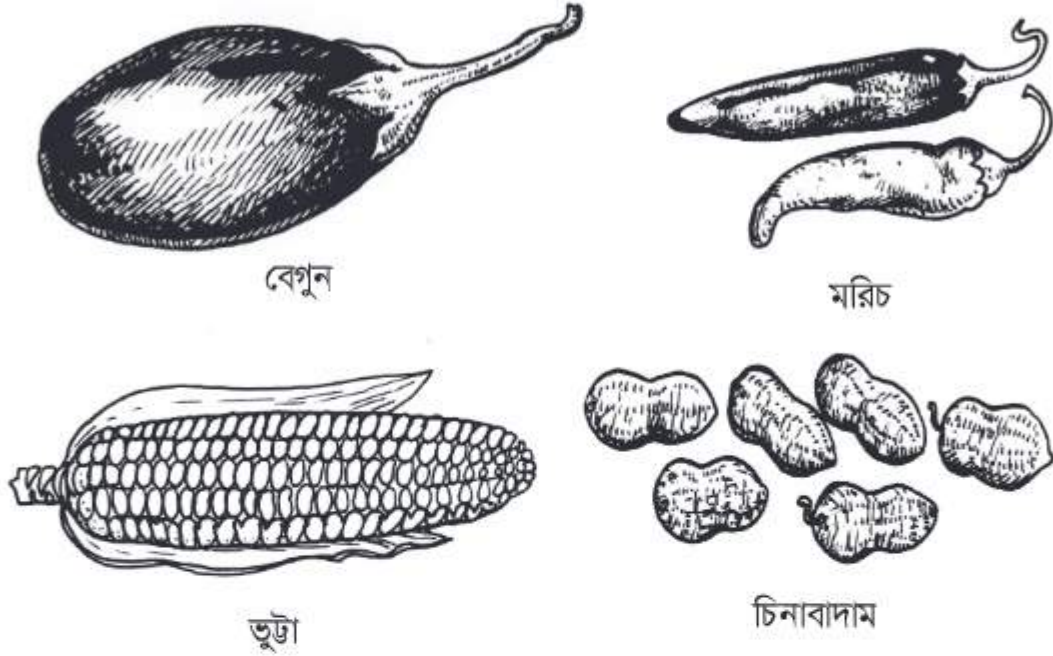
পূর্ববর্তী পাঠে আমরা মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানতে পেরেছি। এসব মৌসুমি ফসলের ক্ষেত্রে এক মৌসুমের ফসল অন্য মৌসুমে চাষ করা যায় না। কিন্তু এমন কতগুলো ফসল রয়েছে যাদের সারা বছর লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। তোমরা কি এ ধরনের কিছু ফসলের নাম বলতে পারবে?

যেসব ফসল সারা বছর লাভজনকভাবে চাষ করা হয় তাদেরকে মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল বা বারমাসি ফসল বলা হয়। মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলোকে আবার দিবা নিরপেক্ষ ফসলও বলে। কারণ যেকোনো দৈর্ঘ্যের দিনে এসব ফসল ফুল-ফল উৎপাদন করতে পারে। ফসলের ফুল-ফল উৎপাদনে দিবা দৈর্ঘ্যের প্রভাবের বিষয়ে আমরা পরের পাঠে বিস্তারিত জানব। আমাদের দেশে মৌসুম নিরপেক্ষ উদ্যান ফসলগুলোর মধ্যে রয়েছে— লালশাক, বেগুন, মরিচ, পেঁপে, কলা ইত্যাদি। অন্যদিকে মৌসুম নিরপেক্ষ মাঠ ফসলগুলোর মধ্যে রয়েছে— ভুট্টা, চিনাবাদাম ইত্যাদি।

আমাদের দেশে আবহাওয়া ও জলবায়ুগত সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ফসল সারা বছর চাষ করা যায় না। তবে কিছু উচ্চমূল্যের ফসল রয়েছে যা সারা বছর চাষ করা সম্ভব হলে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো না— যেমন টমেটো ও পেঁয়াজ। এ সমস্যা সমাধানের জন্য মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের জাত নিয়ে গবেষণা চলছে। ইতোমধ্যে সারা বছর চাষোপযোগী টমেটো ও পেঁয়াজের অনেকগুলো জাত বের করা হয়েছে।

তোমাদের মনে কি এ প্রশ্ন জাগে না যে, কেন কিছু ফসল সারা বছর চাষ করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের ফসলের জলবায়ুগত চাহিদার কথা ভাবতে হবে। আমরা জানি রবি ফসলের জন্য এক ধরনের এবং খরিপ ফসলের জন্য আরেক ধরনের জলবায়ুর প্রয়োজন। মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলো রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমেই জন্মাতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলোর জলবায়ুগত চাহিদার বিস্তার অনেক বেশি হবে। ফলে এ ফসলগুলো উভয় মৌসুম বা সারা বছর চাষ করা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলো—

১. কম তাপমাত্রা থেকে বেশি তাপমাত্রায় জন্মাতে পারে।
২. কম বৃষ্টিপাত থেকে বেশি বৃষ্টিপাতে জন্মাতে পারে।
৩. কম অর্দ্রতা থেকে বেশি অর্দ্রতায় জন্মাতে পারে।
৪. স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্য থেকে দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যে ফুল-ফল উৎপাদন করতে পারে।



চিত্র-৪.৮: মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল

কাজ : শিক্ষার্থীরা চারটি দলে ভাগ হয়ে যাও। এবার তোমাদের দেখানো মিশ্র ফসলের চার্ট থেকে মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের একটি তালিকা তৈরি কর এবং উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল

পাঠ-৫ : ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব

কোন অঞ্চলে কী ধরনের ফসল জন্মাবে তা ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এসব উপাদান কীভাবে ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

১. সূর্যালোক : সূর্যালোক অনেকভাবে ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা জানি উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। এ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমন্বয়ে পাতায় খাদ্য তৈরি হয়। সূর্যালোকের প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদকে প্রধানত দুই ভাগ করা হয়; যথা- ক) আলো পছন্দকারী উদ্ভিদ ও খ) ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ। ভুট্টা, আখ পূর্ণ সূর্যালোকে ভালো জন্মে আবার চা, কফি ছায়া পছন্দ করে।

দৈনিক আলোর সংস্পর্শে আসার সময় দিনের দৈর্ঘ্য ফসলের ফুল-ফল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। দিনের দৈর্ঘ্যের উপর সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—

ক) দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ বা বড় দিনের উদ্ভিদ : এসব উদ্ভিদের ফুল-ফল উৎপাদনের জন্য দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টার বেশি প্রয়োজন হয়। যেমন— আউশ ধান, পাট, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, ধুন্দল ইত্যাদি।

খ) স্বল্প দিবা উদ্ভিদ বা ছোট দিনের উদ্ভিদ : এসব উদ্ভিদের ফুল-ফল উৎপাদনের জন্য দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টার কম প্রয়োজন হয়। যেমন— গম, সরিষা, আমন ধান, গিমা, কলমি, পুঁইশাক।

গ) দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ : যেকোনো দৈর্ঘ্যের দিনে এসব ফসলের ফুল-ফল উৎপাদিত হয়ে থাকে। যেমন— চিনাবাদাম, টমেটো, কার্পাস তুলা ইত্যাদি।

২. তাপমাত্রা : বেঁচে থাকার জন্য সকল উদ্ভিদে একটি সর্বনিম্ন, সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে। একে কার্ডিনাল তাপমাত্রা বলে। কার্ডিনাল তাপমাত্রা উদ্ভিদের প্রজাতি ও জাত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোনো স্থানের ফসলের বিস্তৃতি কার্ডিনাল তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাপমাত্রার চাহিদা অনুযায়ী আবাদযোগ্য ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা— ঠাণ্ডা ঋতুর ফসল ও উষ্ণ ঋতুর ফসল।

ক) ঠাণ্ডা ঋতুর ফসল : এরা অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রা পছন্দ করে; যেমন— গম, আলু, ছোলা, মসুর, ফুলকপি, ওলকপি ইত্যাদি। এদের জন্মানোর জন্য সর্বনিম্ন 0° – 5° সে., সর্বোত্তম 25° – 31° সে. এবং সর্বোচ্চ 31° – 39° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

খ) উষ্ণ ঋতুর ফসল : এ ফসলগুলো অপেক্ষাকৃত উচ্চতাপমাত্রায় জন্মে; যেমন— পাট, রাবার, কাসাভা। এদের জন্মানোর জন্য সর্বনিম্ন 15° – 18° সে., সর্বোত্তম 31° – 39° সে. এবং সর্বোচ্চ 48° – 50° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

৩. বৃষ্টিপাত : উদ্ভিদের জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ মাটিতে ধারণকৃত পানির উপর নির্ভরশীল। আর বৃষ্টিপাত মাটিতে ধারণকৃত পানির প্রধান উৎস। সেজন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময় ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফসল জন্মে থাকে।

৪. বায়ুপ্রবাহ : প্রস্বেদন, সালোকসংশ্লেষণ, ফুলের পরাগায়ন ইত্যাদি বায়ু প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫. বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ : ফসলের প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে উচ্চ জলীয়বাষ্প সহায়ক। দানা গঠন পর্যায়ে নিম্ন জলীয়বাষ্প দানার সংকোচন ঘটাতে পারে। বাতাসে অধিক জলীয়বাষ্পের পরিমাণ রোগজীবাণু ও পোকের বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করে।

৬. শিশিরপাত ও কুয়াশা : কোনো কোনো সময় শিশিরপাত ও কুয়াশা বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়ে ফসলে রোগ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা চারটি দলে ভাগ হয়ে ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারকারী আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : স্বল্প দিবা উদ্ভিদ, দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ, দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ, আলো পছন্দকারী, ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ, কার্ডিনাল তাপমাত্রা

পাঠ- ৬ : ফসল উৎপাদনে প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব

আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুকূল থাকলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ুতে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়, এমনকি উৎপাদন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমরা এ পাঠে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করব। এ ধরনের আবহাওয়ায় ফসলের কী ধরনের ক্ষতি হয় সে সম্পর্কেও জানব।

১. অতিবৃষ্টি : স্বাভাবিকের তুলনায় যখন কোনো স্থানে বেশি বৃষ্টিপাত হয় তখন তাকে আমরা অতিবৃষ্টি বলি। অতিবৃষ্টির কারণে বর্ষাকালে শাকসবজির উৎপাদন বাহত হয়। অতিবৃষ্টির কারণে শাকসবজির গাছ মাটিতে হেলে পড়ে পাতা, ফুল-ফল নষ্ট হয়ে যায়। অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মাটিতে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। এ অবস্থায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি অনেক গাছ মারাও যায়; যেমন— কাঁঠাল, পেঁপে। এ জন্য অতিবৃষ্টির মাধ্যমে জমা পানি দ্রুত নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়।

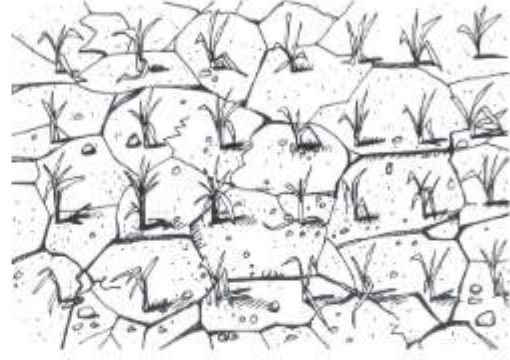
২. শিলাবৃষ্টি : বৃষ্টিপাতের সাথে যখন বরফ খণ্ড পতিত হয় তখন তাকে শিলাবৃষ্টি বলে। বাংলাদেশে প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টির পরিমাণ দেশের উত্তরাঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বেশি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালবৈশাখীর সাথে শিলাবৃষ্টি হয়। শিলাবৃষ্টি ফসলের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। শিলার আঘাতে ফসলের পাতা, কচি ডাল, ফুল, ফল ভেঙে ঝরে পড়ে, খেঁতলে যায়। শিলাবৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফসল মাটির সাথে মিশে যেতে পারে। আমাদের দেশে বোরো ধান, পাট, আম, কলা, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ফসল শিলাবৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৩. খরা : দীর্ঘ দিন বৃষ্টিপাতহীন অবস্থাকে খরা বলে। আমাদের দেশে চৈত্র মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত সময়ে একটানা ২০ দিন বা তার বেশি দিন ধরে কোনো বৃষ্টিপাত না হলে তাকে খরা বলে। অনাবৃষ্টির কারণে মাটিতে ক্রমান্বয়ে রসের ঘাটতি দেখা দেয়। ফসল যে পরিমাণ পানি মাটি থেকে শোষণ করে তার চেয়ে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বেশি পানি ত্যাগ করে। এ অবস্থায় ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি অবস্থা বিরাজ করে। এ অবস্থাকে খরা কবলিত বলা হয়। খরার ফলে গাছ নেতিয়ে পড়ে, খরা তীব্র হলে গাছ শুকিয়ে মারা যায়। খরার ফলে ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ফসলের ফলন কমে যায়। ফসলের ক্ষতির মাত্রার উপর নির্ভর করে খরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা— তীব্র খরা, মাঝারি খরা এবং সাধারণ খরা। তীব্র খরায় ৭০-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়। মাঝারি খরায় ৪০-৭০ ভাগ এবং সাধারণ খরায় ১৫-৪০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় সকল মৌসুমেই ফসল খরায় কবলিত হয়। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর এবং মধুপুর অঞ্চলে তীব্র থেকে মাঝারি খরা দেখা দেয়।

৪. বন্যা : বন্যার পানির উচ্চতা, পানির গতি ও বন্যার স্থায়িত্বের উপর ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি নির্ভর করে। নিচু ও মাঝারি নিচু এলাকা বন্যার পানিতে প্রাণিত হয়। ফলে ফসল বিশেষ করে ধানক্ষেত ডুবে যায়। সাধারণত আমন ধান রোপণের সময় বা রোপণের পর বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ঢল বন্যায় হাওর অঞ্চলে বোরো ধান পাকার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



চিত্র-৪.৯ : বন্যা



চিত্র-৪.১০ : খরা কবলিত ধানক্ষেত

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। এক দল অতিবৃষ্টি এবং অপর দল শিলাবৃষ্টির কারণে ফসলের কী কী ক্ষতি হয় তার তালিকা তৈরি করে বোর্ডে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তীব্র খরা, মাঝারি খরা, সাধারণ খরা

পাঠ-৭ : কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রায় সব ফসলই এদেশের মাটিতে জন্মায়। তবে সব এলাকায় সব ফসল জন্মায় না। ফসল জন্মানো নির্ভর করে এলাকার পরিবেশের উপর। অতএব এদেশে ফসল তথা কৃষি কার্যক্রম চালাতে এলাকাভিত্তিক কৃষি পরিবেশ জানা দরকার। অর্থাৎ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল কৃষি কার্যক্রমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আমরা জানি বাংলাদেশের কোথাও বৃষ্টিপাত বেশি আবার কোথাও কম হয়। কোথাও তাপমাত্রা কম এবং কোথাও বেশি। একেক অঞ্চলের মাটি একেক প্রকার। এসবই হলো পরিবেশ। এ পরিবেশের জন্যই বাংলাদেশের রাজশাহীতে আমের ফলন ভালো, দিনাজপুরে লিচুর ফলন ভালো, শ্রীমঙ্গলে চা ও কমলার ফলন ভালো, যশোরে খেজুরের ফলন ভালো। তাই আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

কাজ-১ : শিক্ষক বাংলাদেশের একটি মানচিত্র বোর্ডে ঝুলাবেন। শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে বাংলাদেশের কোন জেলায় কোন ফসল ভালো জন্মে সেগুলোর নাম ও জেলার নাম টুকরা কাগজে লিখে মানচিত্রে বসাতে বলবেন। পরিশেষে ফসলসমৃদ্ধ মানচিত্রটি ব্যাখ্যা করবেন।

ভিডিও প্রদর্শন: শিক্ষক বাংলাদেশের বিভিন্ন ফসলের এলাকাভিত্তিক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করে এক নজরে বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরবেন।

বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

সর্বশেষ ১৯৮৮-১৯৮৯ সালে বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদনের জন্য ফসল নির্বাচন, ফসল পরিচর্যা, রোগবালাই দমন ও ব্যবস্থাপনা এই সকল ক্ষেত্রে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল বিবেচনায় নেওয়া হয়।

পরিবেশ অঞ্চল গঠনে কতগুলো নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়। প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ভূমি, কৃষি আবহাওয়া, মৃত্তিকা এবং পানি পরিস্থিতি। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার বিভাজন রয়েছে। যেমন- ভূমির শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে ৫ ভাগে। উঁচু ভূমি, মাঝারি উঁচু ভূমি, মাঝারি নিচু ভূমি, নিচু ভূমি এবং অতি নিচু ভূমি।

কৃষি আবহাওয়া প্রসঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয় খরিপ-পূর্ব আবহাওয়া, খরিপ আবহাওয়া, রবি আবহাওয়া ও চরম তাপমাত্রা।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল নির্ধারণে পানি পরিস্থিতি বা মাটির আর্দ্রতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ছাড়া নদীর অববাহিকা, হাওর-বাঁওড় এলাকাও বিবেচনায় নেওয়া হয়।

মৃত্তিকার শ্রেণি বিবেচনায় বেলে মাটি, ঐটেলে মাটি, বেলে দোআঁশ, ঐটেলে দোআঁশ এবং এর পাশাপাশি মাটির P^H ও (অম্লত্ব-ক্ষারত্ব) বিবেচ্য।

পাঠ- ৮ : কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী ফসল বৈচিত্র্য

কৃষি পরিবেশের কারণে এক এক অঞ্চলে আমরা এক একটি বিশেষ ফসলের প্রাধান্য দেখতে পাই। যদিও ধান, পাট, গম, আলু ইত্যাদি ফসল প্রায় সকল কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়।

পরিবেশ অঞ্চল ১ দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও নিয়ে গঠিত। এখানকার বিশেষ ফসল হচ্ছে লিচু ও আম। এখন এই এলাকায় চা এবং কমলার চাষও শুরু হয়েছে।

পরিবেশ অঞ্চল ২-এ রয়েছে তিস্তার চর। নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার কিছু কিছু অংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বিশেষ ফসল চিনাবাদাম, কাউন। পরিবেশ অঞ্চল ৩ ও ৪ এলাকায় রয়েছে রংপুর ও বগুড়ার অংশবিশেষ। এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তামাক এবং সবজি।

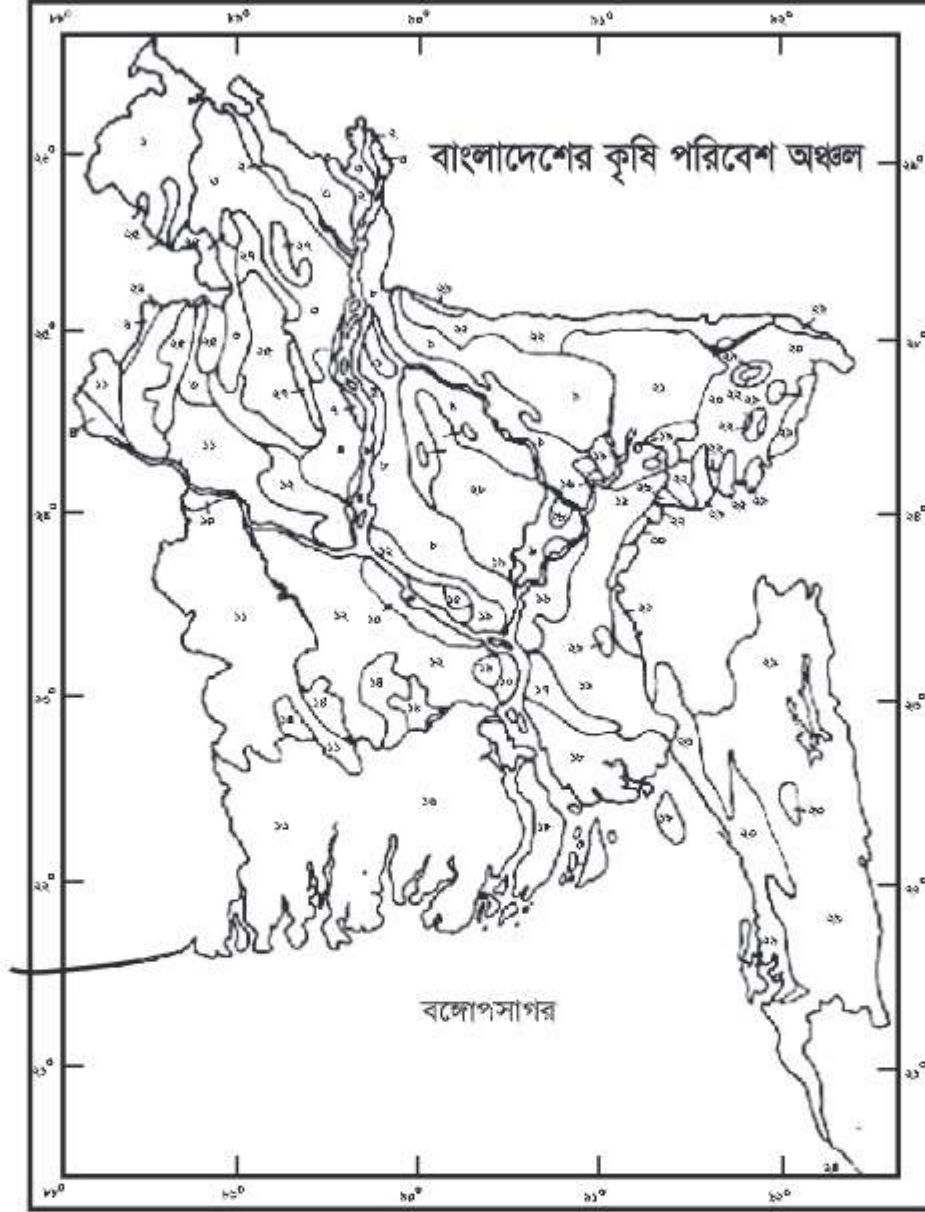
পরিবেশ অঞ্চল ৫ ও ৬ চলন বিল, আত্রাই ও পুনর্ভবা নদী এলাকার নিচু জমি নিয়ে গঠিত যা নওগাঁ, নাটোর ও টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো পাটি, বেত উৎপাদন। এখন তরমুজ ও রসুন ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

পরিবেশ অঞ্চল ৭-এ পড়েছে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলার ব্রহ্মপুত্র চর এলাকাগুলো। এ সকল অঞ্চলের বিশেষ ফসল হচ্ছে চিনাবাদাম ও মিষ্টি কুমড়া।

ব্রহ্মপুত্র পাড় এলাকাগুলো পরিবেশ অঞ্চল ৮-এর অন্তর্ভুক্ত। শেরপুর ও জামালপুর জেলার অংশ বিশেষ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ অঞ্চল ৮-এর বিশেষ ফসল পানিফল। পরিবেশ অঞ্চল ৯-এ পড়েছে শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল। পরিবেশ অঞ্চল ৯-এ প্রায় সকল ফসলই হয়।

পরিবেশ অঞ্চল ১০ জুড়ে রয়েছে পদ্মার চরাঞ্চল। চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার অংশ বিশেষ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে চিনাবাদাম প্রধান ফসল। পরিবেশ অঞ্চল ১১ পুরাতন গজা বিধৌত এলাকা। ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরার অনেক এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসল কার্পাস তুলা। পরিবেশ অঞ্চল ১২-এ রয়েছে পদ্মার পাড়। ফরিদপুর, মাদারীপুর ও পাবনা জেলার অনেক এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিশেষ ফসল বোনা আমন ও তাল। পরিবেশ অঞ্চল ১৩-এ রয়েছে খুলনার উপকূল অঞ্চল। এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো সুন্দরবন। পরিবেশ অঞ্চল ১৪-এ রয়েছে গোপালগঞ্জের বিলের পাড় এলাকা, এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদ হলো তালগাছ ও খেজুর। পরিবেশ অঞ্চল ১৫-এ রয়েছে আড়িয়াল বিল এলাকা। এখানে বোনা আমন প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসল।

পরিবেশ অঞ্চল ১৬-এ মধ্য মেঘনা এলাকা রয়েছে। কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরের কিছু কিছু এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে জমি মাঝারি উঁচু। এখানে আলুসহ অন্যান্য সবজি ও কলা জন্মায়। পরিবেশ অঞ্চল ১৭-এ রয়েছে কুমিল্লা-নোয়াখালীর সীমান্ত এলাকা। এখানে চিনাবাদাম, ভুটাসহ সাধারণ ফসল জন্মায়। পরিবেশ অঞ্চল ১৮-এ রয়েছে ভোলার চর। এখানে নারিকেল ও পান বিশেষ ফসল। পরিবেশ অঞ্চল ১৯-এ রয়েছে পূর্ব মেঘনা এলাকা। কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরের অনেক এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বিশেষ ফসল বোনা আমন। পরিবেশ অঞ্চল ২০-এ রয়েছে সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওরসহ হাওর এলাকাগুলো। এখানে বোরো ধান ও মাছ উৎপাদন এলাকাগুলো রয়েছে। পরিবেশ অঞ্চল ২১-এ রয়েছে সুরমা-কুশিয়ারার দুই পাড়। সুনামগঞ্জের অনেক এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বোরো ধান, মাছ ও সবজি উৎপাদন হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ের পাদদেশগুলো পরিবেশ অঞ্চল ২২-এর অধীনে পড়েছে। নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার কিছু কিছু অংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সুপারি, লেবু, কমলা, খাসিয়া পান এই এলাকার বৈশিষ্ট্য। এখন এসব এলাকায় আগর উৎপাদন হচ্ছে। পরিবেশ অঞ্চল ২৩-এ রয়েছে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার উপকূল অঞ্চল। এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসল পান। পরিবেশ অঞ্চল ২৪-এ রয়েছে সেন্টমার্টিন কোরাল দ্বীপ। এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদ হচ্ছে নারিকেল।



১. পুরাতন হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল ২. সক্রিয় তিষ্ঠা প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ৩. তিষ্ঠা বাক প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ৪. করতোয়া-বাতাগি প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ৫. নিম্নতর আত্মাই অববাহিকা অঞ্চল ৬. নিম্নতর পুনর্ভবা প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ৭. সক্রিয় ব্রহ্মপুত্র ও বহুলা প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ৮. নতুন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ৯. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ১০. সক্রিয় গঙ্গা প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ১১. উঁচু গঙ্গা নদী প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ১২. নিচু গঙ্গানদী প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ১৩. গঙ্গার গোয়াল-ভাটা প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ১৪. গোপালগঞ্জ-খুলনা বিল অঞ্চল ১৫. আড়িয়াল বিল অঞ্চল।

১৬. মহা-মেঘনা নদী প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ১৭. নিম্নতর মেঘনা নদী প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ১৮. নতুন মেঘনা নদী প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ১৯. পুরানো মেঘনা মোহনা প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ২০. সুরমা-কুশিয়ারা পূর্বদিকস্থ প্রাণিত ভূমি অঞ্চল ২১. সিলেট অববাহিকা অঞ্চল ২২. উত্তর ও পূর্বকূল পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল ২৩. চট্টগ্রাম উপকূল সমভূমি অঞ্চল ২৪. সেন্টমার্টিন প্রবাল ছীগ অঞ্চল ২৫. সমতল বরেন্দ্র অঞ্চল ২৬. উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চল ২৭. উত্তর-পূর্বকূলীয় বরেন্দ্র অঞ্চল ২৮. মধুপুর অঞ্চল ২৯. উত্তরকূলীয় ও পূর্বকূলীয় পার্বত্য অঞ্চল ৩০. আখাউড়া সোণাল অঞ্চল।

পরিবেশ অঞ্চল ২৫, ২৬, ও ২৭ এলাকাজুড়ে রয়েছে যথাক্রমে রাজশাহী, বগুড়া ও দিনাজপুরের বরেন্দ্র অঞ্চল। এখানে উঁচু এলাকায় প্রায় সকল ফসলই ফলে। পরিবেশ অঞ্চল ২৮ মধুপুর থেকে ঢাকার তেজগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত লালমাটি অঞ্চল। এখানকার বিশেষ বৃক্ষ হচ্ছে শাল। এখানকার ফসল হচ্ছে কাঁঠাল ও আনারস। সকল পাহাড়ি অঞ্চল পরিবেশ অঞ্চল ২৯-এর অন্তর্গত। রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও মৌলভীবাজার ছাড়াও অন্যান্য জেলার পাহাড়ি এলাকাগুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বিশেষ ফসল চা। পরিবেশ অঞ্চল ৩০-এ রয়েছে আখাউড়ার লালমাটি অঞ্চল। এখানকার প্রধান ফসল কাকরোল এবং মুকুন্দপুরী পেয়ারা।

এই বিস্তৃত বিবরণের মূল উদ্দেশ্য হলো এই কথাটি জানানো যে, বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও এর কৃষি বৈচিত্র্য বিশাল। যাহোক, পরিবেশ অঞ্চল ৩, ৯, ১১ এবং আংশিকভাবে ১৬ উদার কৃষি পরিবেশ এলাকা। এই এলাকাজুড়ে উৎপন্ন ধান-পাটসহ নানা ফসলের জন্য বাংলাদেশ 'সোনার বাংলা' নামে অভিহিত।

কাজ : তোমার অঞ্চলে কী ধরনের ফসল ফলে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মৌসুমে সেচের প্রয়োজন বেশি।
২. তীব্র খরায় ভাগ ফলন ঘাটতি হয়।
৩. বৃষ্টিপাতের সাথে যখন বরফ খণ্ড পতিত হয় তখন তাকে বলে।
৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালবৈশাখীর সাথে হয়।

মিলকরণ

| | বামপাশ | ডানপাশ |
|----|--|------------------------|
| ১. | চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস | খরিপ-২ মৌসুমে |
| ২. | তাপ ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে | কৃষিপ্রধান দেশ |
| ৩. | আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুকূলে থাকলে | ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায় |
| ৪. | বাংলাদেশ একটি | রবি মৌসুম |

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ক. খরা বলতে কী বোঝ?
- খ. স্বল্প দিবা উত্ত্বিদ কাকে বলে?
- গ. শিলাবৃষ্টিতে ফসলের কী ধরনের ক্ষতি হয়?
- ঘ. অতিবৃষ্টি বলতে কী বোঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ক. ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।
- খ. বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের বর্ণনা দাও।
- গ. মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের বর্ণনা দাও।
- ঘ. কৃষি মৌসুমের বর্ণনা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে শিলাবৃষ্টি কখন হয়—

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ক. বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে | খ. আষাঢ় ও শ্রাবণে |
| গ. ফাল্গুন ও চৈত্রে | ঘ. চৈত্র ও বৈশাখে |

২. দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদগুলো হলো—

- i. চিনাবাদাম, টমেটো, পেঁপে
- ii. আউশ ধান, বেগুন, কলা
- iii. ভুট্টা, ফুলকপি, আলু

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



চিত্র-১



চিত্র-২

৩. চিত্র-২ এর উদ্ভিদটি -

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ক. সেন্টমার্টিনের কোরাল দ্বীপের | খ. পাহাড়ি অঞ্চলের |
| গ. সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওরের | ঘ. ময়মনসিংহ অঞ্চলের |

৪. চিত্র-১-এর উদ্ভিদটি-

- i. অর্থকরী ফসল
- ii. পানীয় প্রদানকারী
- iii. গুল্মজাতীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

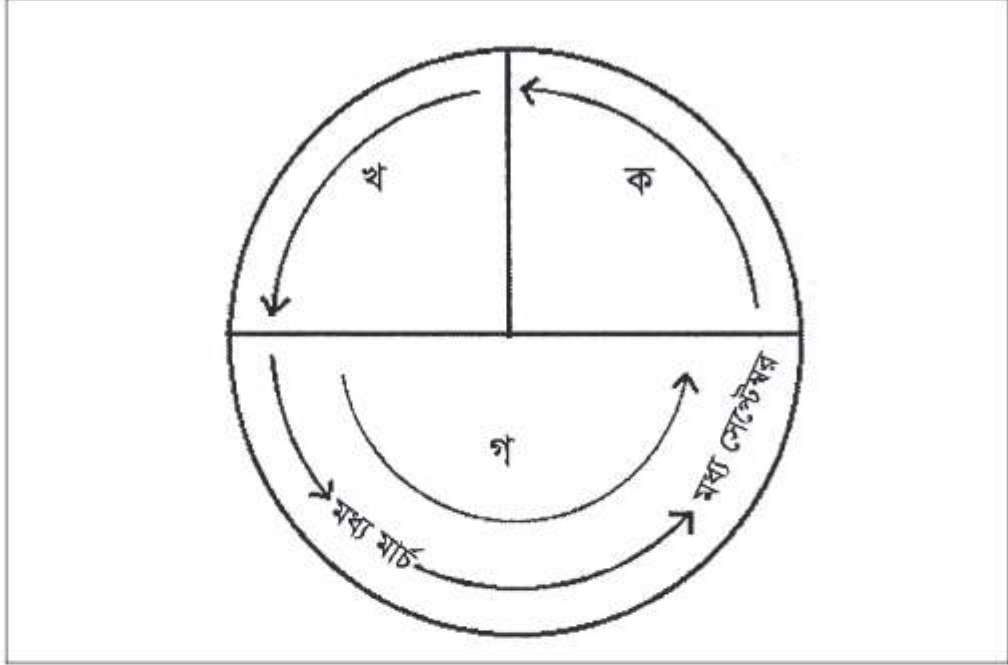
- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সাদিকের বাড়িটি কম বৃষ্টিপাতপ্রবণ অঞ্চলে হলেও প্রচুর শাক-সবজি উৎপাদন হয়। সাদিক কিছু টাটকা সবজি নিয়ে তার মায়ের সাথে চট্টগ্রামের টিলাতলে মামাবাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে একদিন সে দেখে হঠাৎ করে আকাশ ঘনকালো মেঘে ঢেকে আসে ও ঝড়- বাতাস শুরু হয় এরপর শুরু হয় বৃষ্টি।

- ক. ফসলের মৌসুম বলতে কী বোঝ?
- খ. আলুকে কার্ডিনাল তাপমাত্রার সবজি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্ভিদপকের আলোকে সাদিকের কৃষি অঞ্চলের ফসলের বৈশিষ্ট্য মৌসুম অনুযায়ী বর্ণনা কর।
- ঘ. সাদিক ও তার মামা বাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর।

২.

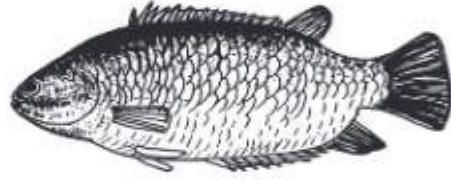
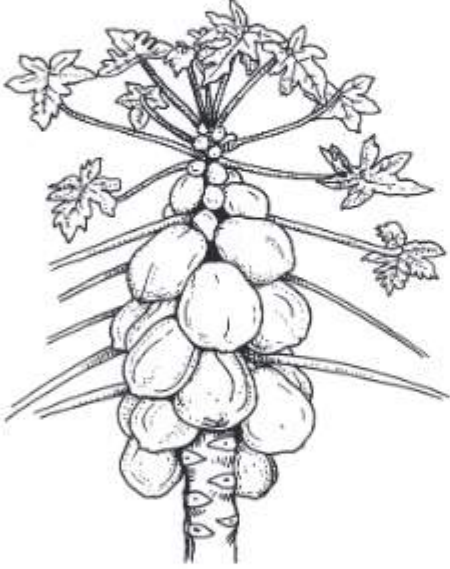


চিত্র- বার মাসের ভিত্তিতে কৃষি মৌসুমের গ্রাফ

- ক. আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিত্তিতে বাংলাদেশকে কয়টি কৃষি অঞ্চলে ভাগ করা হয়?
- খ. কোন পরিস্থিতিতে শীতকালে ফসলের রোগজীবাণুর বিস্তার ঘটে- ব্যাখ্যা কর।
- গ. গ্রাফে চিহ্নিত কৃষি মৌসুমের কোন অংশটিতে সেচের তেমন প্রয়োজন হয় না, কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. চিত্রে 'গ' চিহ্নিত কৃষি মৌসুমের ফসলে তাপমাত্রার প্রভাব মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায় কৃষিজ উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদন বলতে ফসল, গৃহপালিত পশুপাখি এবং মাছ উৎপাদনকে বোঝায়। এ অধ্যায়ে ফসল উৎপাদনের মধ্যে শস্য চাষ (ভুট্টা), ফুল চাষ (রজনীগন্ধা ও গাঁদা) এবং ফলের চাষ (পেয়ারা ও পেঁপে) পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাছ চাষ ও রোগ ব্যবস্থাপনা (কৈ মাছ), পাখি পালন ও রোগ ব্যবস্থাপনা (মুরগি) এবং গৃহপালিত পশু পালন ও রোগ ব্যবস্থাপনা (ছাগল) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে কৃষি উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- শস্য চাষ (ভুট্টা) পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- বিভিন্ন প্রকার ফুল চাষ ও ফল চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- মাছ চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- মাছের রোগ প্রতিরোধের উপায় এবং রোগ ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- গৃহপালিত পাখি পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- গৃহপালিত পশুপাখির রোগ ব্যবস্থাপনা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- কৃষিজ উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে পারব।

পাঠ-১ : ভুট্টা চাষ পদ্ধতি

ভুট্টা একটি অধিক ফলনশীল ও বহুমুখী ব্যবহার সম্পন্ন দানা শস্য। বাংলাদেশে ভুট্টার চাষ বাড়ছে। ভুট্টা বর্ষজীবী গুল্ম প্রকৃতির। একই গাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল জন্মে। পুরুষ ফুল একটি মঞ্জিরিডণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে গাছের মাথায় বের হয়। স্ত্রী ফুল গাছের মাঝামাঝি উচ্চতায় কান্ড ও পাতার অক্ষকোণ থেকে মোচা আকারে বের হয়। স্ত্রী ফুল নিষিক্ত হলে মোচার ভিতরে দানার সৃষ্টি হয়। ধান ও গমের তুলনায় ভুট্টা দানার পুষ্টিমান বেশি। ভুট্টার দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং এর রসাল গাছ ও সবুজ পাতা উন্নত মানের গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে আমাদের দেশে ভুট্টা দানার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।



চিত্র-৫.১: ভুট্টা গাছ

জাত : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ভুট্টার অনেকগুলো উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে বর্ণালি, শুভ্রা, মোহর, বারি ভুট্টা-৫, বারি ভুট্টা-৬, বারি ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-২, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৩ অন্যতম। এছাড়া খই (পপ কর্ণ) এর জন্য বের করেছে খই ভুট্টা এবং কচি অবস্থায় খাওয়ার জন্য বের করেছে বারি মিষ্টি ভুট্টা-১। এর বাইরে বিভিন্ন বীজ কোম্পানি বিদেশ থেকে হাইব্রিড জাতের ভুট্টা বীজ আমদানি করে থাকে।

মাটি : বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি ভুট্টা চাষের জন্য উত্তম। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমিতে যেন পানি না জমে।

বপন সময় : আমাদের দেশে রবি মৌসুমে অক্টোবর-নভেম্বর এবং খরিপ মৌসুমে মধ্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি : বারি ভুট্টা জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি এবং খই ভুট্টার জন্য ১৫-২০ কেজি হারে বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সেমি এবং সারিতে ২৫ সেমি দূরত্বে ১টি অথবা ৫০ সেমি দূরত্বে ২টি গাছ রাখতে হবে।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ : আমাদের দেশে রবি মৌসুমে ভুট্টার চাষ বেশি হয়ে থাকে। ৪-৫টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

ভুট্টা চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো :

| সারের নাম | সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) |
|-----------|----------------------------|
| ইউরিয়া | ১৭২-৩১২ |
| টিএসপি | ১৬৮-২১৬ |
| এমওপি | ৯৬-১৪৪ |
| জিপসাম | ১৪৪-১৬৮ |

জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে মোট ইউরিয়ার এক-তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। এছাড়াও এ সময় হেক্টর প্রতি জিংক সালাফেট ১০-১৫ কেজি, বোরন সার ৫-৭ কেজি এবং গোবর সার ৫ টন প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। বাকি ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে, প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০-৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি গাছের গোড়া বরাবর তুলে দিতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে খাদ্যশস্য ফসলের একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : উপরি প্রয়োগ, ভুট্টার মোচা

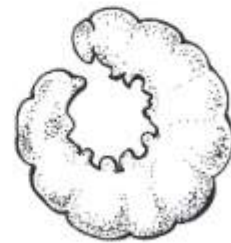
পাঠ-২ : ভুট্টা চাষে পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ

সেচ প্রয়োগ : উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পেতে হলে রবি মৌসুমে ৩-৪টি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। ৫ পাতা পর্যায়ে প্রথম, ১০ পাতা পর্যায়ে দ্বিতীয়, মোচা বের হওয়ার সময়ে তৃতীয় এবং দানা বাঁধার পূর্বে চতুর্থ সেচ দিতে হয়। ভুট্টার জমিতে যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।



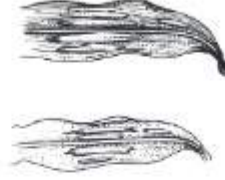
চিত্র-৫.২ : বিভিন্ন বয়সের ভুট্টা গাছ

পোকা দমন ব্যবস্থাপনা : ভুট্টা ফসলে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম হয়। তবে চারা অবস্থায় কাটুই পোকার লার্ভা গাছের গোড়া কেটে দেয়। এরা দিনের বেলায় মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে বের হয়। সদ্য কেটে ফেলা গাছের চারপাশের মাটি খুঁড়ে পোকার লার্ভা বের করে মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ফুরাদান অথবা ডারসবার্ন অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে জমিতে সেচ দিতে হবে।



চিত্র-৫.৩ : কাটুই পোকার লার্ভা

ভুট্টা ফসলের রোগ : ভুট্টা ফসলে বেশ কয়েকটি রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন-ভুট্টার বীজ পচা ও চারা মরা রোগ, পাতা ঝলসানো রোগ, কাণ্ড পচা রোগ, মোচা ও দানা পচা রোগ। এ রোগগুলো বিভিন্ন ধরনের বীজ ও মাটিবাহিত ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে। ভুট্টার বীজ বপনের সময় মাটিতে রস বেশি এবং তাপমাত্রা কম থাকলে বীজ পচা ও চারা মরা রোগ দেখা দেয়। পাতা ঝলসানো রোগে আক্রান্ত গাছের নিচের দিকের পাতায় লম্বাটে ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরে তা গাছের উপরের অংশে ছড়িয়ে পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় এবং গাছ মরে যায়।



চিত্র-৫.৪ : পাতা ঝলসানো রোগ

রোগ দমন পদ্ধতি

- ১) রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।
- ২) বীজ বপনের পূর্বে শোধন করে নিতে হবে।
- ৩) ভুট্টা কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ৪) একই জমিতে বার বার ভুট্টা চাষ বন্ধ করতে হবে।

ভুট্টা সংগ্রহ ও মাড়াই : মোচা চকচকে খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে, দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। ভুট্টা গাছের মোচা ৭৫-৮০% পরিপক্ব হলে ফসল সংগ্রহ করা যাবে। মোচা সংগ্রহের পর ৪-৫ দিন রোদে শুকাতে হবে। অতঃপর হস্ত বা শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র দ্বারা দানা ছাড়িয়ে বাছাই-ঝাড়াই করে সংরক্ষণ করতে হবে।

জীবনকাল : রবি মৌসুমে ভুট্টা গাছের জীবনকাল ১৩৫-১৫৫ দিন এবং খরিপ মৌসুমে জীবনকাল ৯০-১১০ দিন।

ফলন : বাংলাদেশে রবি মৌসুমে ভুট্টার ফলন বেশি হয় এবং খরিপ মৌসুমে ফলন কম হয়। জাত ও মৌসুম ভেদে ভুট্টার ফলন ৩.৫-৮.৫ টন/হেক্টর হয়ে থাকে।



চিত্র-৫.৫ : হস্তচালিত মাড়াই যন্ত্র

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে ভুট্টা কীভাবে সংগ্রহ করতে হয় সে বিষয়ে খাতায় লেখ এবং উপস্থাপন কর।